থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN

MAGAZINE
An International Refereed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India
DAUL A Theatre Group©2013-15

Editor

Bivash Bishnu Chowdhury

Title: স্বাদেশিকতা থেকে রাজনৈতিকতাঃ রবীন্দ্রনাথের রঙ্গমঞ্চে যাত্রার ভূমিকা [*Swadeshikata Theke Rajnoitikata: Rabindranath-er Rangamanche Jatrar Bhumika*]

Author(s): Arnab Chatterjee
Translator(s): Suman Saha

DOI: https://doi.org/10.63698/thespian.v3.1.YFNT7909
Published: 09 May 2015

স্বাদেশিকতা থেকে রাজনৈতিকতাঃ রবীন্দ্রনাথের রঙ্গমঞ্চে যাত্রার ভূমিকা © 2015 by Suman Saha is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Yr. 3, Issue 2-5, 2015

Bengali New Year Edition
April-May

thespian.articles@gmail.com | www.thespianmagazine.com

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

স্বাদেশিকতা থেকে রাজনৈতিকতাঃ রবীন্দ্রনাথের রঙ্গমঞ্চে যাত্রার ভূমিকা

------------- অর্ণব চ্যাটার্জী
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ
হরিশচন্দ্র কলেজ, পিপলা, মালদা।

অনুবাদক – *সুমন সাহা*, এম.এ. ১ম বর্ষ, ইংরেজী বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হল রবীন্দ্রনাথের নাট্য ভাবনায় ও রঙ্গমঞ্চে যাত্রার ভূমিকা, তার বিভিন্ন বিভাগ এবং কিভাবে এই জনপ্রিয় দেশজ লোক কাঠামোর আনুষ্ঠানিক প্রদর্শন তাঁর পাঠের জন্য ও অভিনয় প্রদর্শন এর জন্য নাট্য রচনার আকার প্রদান করে। ঠাকুর বাড়ি ও রবীন্দ্রনাথের রঙ্গমঞ্চ সর্বদাই অভিজাত সম্প্রদায় এর জন্যই ধরা হয়ে থাকে যা সাধারন মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। অনেক বিদ্বজ্জন ব্যক্তি রবীন্দ্র নাট্য চেতনায় যাত্রার প্রভাবকে সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করে, এই ধরনের লোকমঞ্চের নিম্নমানের খ্যাতির ধারনার কথা চিন্তা করে। যদিও এই ধরনের লোকসংস্কৃতি এবং লোককাঠামোর উপর রবীন্দ্রনাথের প্রবল উৎসাহ ছিল যা তাঁর নাট্য রচনায় এবং নাটক মঞ্চস্থ করার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। নাট্য রচনা এবং সেটিকে মঞ্চে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি নিরন্তর গবেষণা করে যান, আর আবিরাম চেষ্টা করে যান তাঁর রঙ্গমঞ্চ কে উনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত বাংলা 'থিয়েটার'- এর, যা প্রাথমিক ভাবে পাশ্চাত্য বাস্তববাদী নাট্যশালা দ্বারা প্রভাবিত, তার থেকে আলদা করে সম্পূর্ণ নূতন এক মঞ্চের ঐতিহ্য গঠন করবেন। শুধুমাত্র যাত্রা নয় তাঁর সাথে 'কীর্তন', 'বাউল' এর মতন গ্রামবাংলার ঐতিহ্যশালী লোকসংস্কৃতি, যা কিনা উনবিংশ শাতাব্দির বাংলা 'থিয়েটার' এর আবির্ভাব এর সাথে পরিধি সীমায় ঠেকেছিল, সেটিকেও মনে রেখে তাঁর নাট্য রচনার অন্যতম মুখ্য ভাবনায় রূপান্তরিত করেন। যাত্রা ও আন্যান্য লোকশিল্পের প্রতি তাঁর আকর্ষণ গভীরভাবে স্বদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস বর্ণনার পরিকল্পনার সাথে যুক্ত।

একজন নাট্যকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত বাস্তবধর্মী মঞ্চের বাইরে একদম অন্য মাত্রার এক রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। তিনি যথেষ্ট সচেতনতার সাথে বাস্তবধর্মী নাট্যমঞ্চের সাথে সমতুল্য অবস্থানকে প্রত্যাখান করেন, যেটি তৎকালীন নাট্যশিল্পর উপর আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। যদিও এটি আমাদের সবার মনে রাখা দরকার যে রঙ্গমঞ্চের ধারনা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে ইউরোপীয় ভাবধারার সাথেই যুক্ত। রঙ্গমঞ্চ বা নাট্যশালা বা 'থিয়েটার' কোনটির অস্তিত্বই আমাদের সংস্কৃতিতে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ফিরে যান যাত্রায়। আসিত কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে রবীন্দ্র নাট্য চিন্তায় যাত্রা স্থান করে নেয় এবং তাঁর মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি নাটকের প্রযোজনা এবং উপস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার সাথে সাথে পরিবর্তন হয়। তিনি বলেন "যাত্রাগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তন। যাত্রাগান এই পরিবর্তন এর পথ ধরে রবীন্দ্র নাট্য সাহিত্যে স্থান করে

নেয়” (৩৫৮)। সকলে কিন্তু আসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে একমত হতে পারে না। যদিও আমার প্রচেষ্টা শুধুমাত্র এই নয় যে যাত্রা কিভাবে রবীন্দ্র নাট্য চেতনায় এবং তাঁর রঙ্গমঞ্চে স্থান করে নিল কিন্তু তাঁর সাথে জাতি গঠনের রাজনীতি আর গ্রামীণ সংস্কৃতি পুনর্গঠন প্রকল্পে এর তাৎপর্য উদঘাটন করা। এটি আমাদের যাত্রার বিভিন্ন দিক যা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল সেটি বুঝতে সাহায্য করবে কেন এই লোককাঠামো এর প্রদর্শন রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনায় উল্লেখযোগ্য স্থানের সীমা নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। তাঁর আত্মজীবনী “ছেলেবেলা”-য় তিনি বারংবার যাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর নাট্যচর্চার মধ্যে যদিও তিনি তাঁর তত্ত্ব উপস্থাপন করেননি। “রঙ্গমঞ্চ” (১৯০৩), ‘থিয়েটার’ এর উপর হয়ত তাঁর লেখা একমাত্র প্রবন্ধ, যেখানে তিনি যাত্রার প্রতি তাঁর অভিরুচি স্পষ্ট ভাষায় ব্যাক্ত করেন। তিনি লেখেন “আমাদের দেশের যাত্রা আমার এইজন্যে ভালো লাগে। যাত্রার আভিনয়ে দর্শক ও আভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যাবধান নেই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকুল্যের প্রতি নির্ভর করিয়াই কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া ওঠে।” তাঁর “তপতী” (১৯২৯) নাটকের ভুমিকাতেও তিনি তাঁর যাত্রার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি পরিষ্কার ভাবে বলেন, “নাট্যকাব্য দর্শক এর কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রানবান, গতিশীল; দৃশ্যপট তাঁর বিপরীত; আনধিকার প্রবেশ করে স্বচ্ছলতার মধ্যে থাকে সেই মুখ, মুঢ়, স্থানু; দর্শকের চিত্রদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সঙ্কীর্ণ করে রাখে, মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সঙ্কীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সঙ্কীর্ণ হয় না। এই কারনেই যে নাট্যভিনয়ে আমার কোনো হাতকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই না। কারণ বাস্তব সত্যকে এ বিদ্রুপ করে, ভাবসত্য কে বাঁধা দেয়। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪৬৭)

যদিও কবি মঞ্চের মধ্যে অঙ্কিত ছবি প্রবল ভাবে অপছন্দ করতেন যা দর্শকের কল্পনা করার প্রবনতাকে ব্যাহত করে। “ফাল্গুনী” (১৯১৫) নাটকে কবিশেখর, সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে দর্শকের মনে আঁকা ছবির মতন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কাছে মঞ্চের ভাবমূর্তি প্রতিস্থাপনের স্থান ছিল না। তাঁর মতে দর্শকের মন হল সেই স্থান যেখানে সে সম্পূর্ণ নিজের মতন করে কল্পনা করতে পারে এবং ছবি এঁকে নিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কখনই এ ধরনের নাটক চাননি যা দর্শকের সংবেদনশীলতা এবং কল্পনার অবিরাম দ্বন্দ্বর হানি ঘটায়, যা দর্শকের মনে অভাবনীয় নিষ্ক্রিয়তাকে লালন পালন করে। এটা অনুমিত যে, যে তথ্য নাটকের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে দর্শক সেটা পাঠোদ্ধার করবে এবং মানে উদ্ধারের প্রক্রিয়াতে সে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহন করে নিজের মনেই ‘পাঠ্য’ তৈরি করবে।

অনেকেই এই কথাটি তুলে ধরেছেন যে মঞ্চ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নতুন ধারনার সূচনা হয় ‘শারদোৎসব’(১৯০৮) নাটক

থেকে এবং এই নাটক আর ১৯০৮ সালের পরবর্তী সময়ে লেখা নাটকেই যাত্রার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমি মনে করি নতুন ধরনের নাট্য রচনার বীজ বপন হয় রবীন্দ্রনাথের একদম প্রাথমিক পর্যায়ের নাটকগুলি থেকেই এবং শুরুর দিকের নাটকে যাত্রার প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মধ্যে বাল্মীকি প্রতিভা (১৯৮১), কালমৃগয়া (১৯৮২), মায়ার খেলা (১৯৮৮) উল্লেখযোগ্য। সমালোচকরা এই সব নাটকগুলিকে গীতিনাট্য আখ্যা দিয়েছেন। যদিও এগুলি গীতিনাট্য কিনা তা নিয়ে বিবাদ আছে। আমার মনে হয় এগুলির সাথে 'কৃষ্ণ যাত্রা'-র যথেষ্ট মিল আছে। প্রাসঙ্গিকতা রাখতে এখানে যাত্রার বিভিন্ন প্রকারভেদ জানা দরকার, যেটা প্রাথমিকভাবে তিন প্রকারের – 'কৃষ্ণ যাত্রা', 'নতুন যাত্রা' ও 'গীতাভিনয়' যা পরবর্তীকালে 'ঐতিহাসিক যাত্রা' বা 'সামাজিক যাত্রা'-য় উন্নীত হয়। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের কাহিনী, গান এবং আরও অন্য কিছু কাল্পনিক গল্পের উপর ভিত্তি করে 'কৃষ্ণ যাত্রা' পরিবেশিত হয়। ১৮২০-র দশকে 'কৃষ্ণ যাত্রা', 'নতুন যাত্রা'র সূচনা হয় একদম ধর্মনিরপেক্ষ আমোদ প্রমোদ প্রদানের উদ্দেশ্য নিয়ে। ১৮৬০-এর দশকে 'গীতাভিনয়' এর আবির্ভাব ঘটে 'নতুন যাত্রা' থেকে চিত্তরস, 'কৃষ্ণ যাত্রা' থেকে ভক্তি এবং ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বাংলা নাট্য মঞ্চের কিছু করুণ রসের মিলন ঘটিয়ে। 'গীতাভিনয়' ক্রমাগত তাঁর ঝোঁক নাচ ও গান থেকে কমাতে থাকে, পরিবর্তে গদ্য সংলাপ এর অন্তর্ভুক্তি ঘটায়। রবীন্দ্রনাথ যখন "বাল্মীকি প্রতিভা"র রচনা করেন তখন তিনি সম্ভবত 'কৃষ্ণ যাত্রা' বা 'নতুন যাত্রা' থেকে প্রভাবিত হয়েছিলেন যেখানে আখ্যান গান এর মধ্য দিয়ে উদঘাটিত হয়। "জীবনস্মৃতি" তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে "বাল্মীকি প্রতিভা" কোন গীতিনাট্য নয়, এটি একটা নাটক যেখানে চরিত্ররা গানের মধ্যে দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করেছে। "বাল্মীকি প্রতিভা" তে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। দেশজ রাগ-রাগিনি তে কবি হতাশ হয়েছিলেন। তাঁর মতে ভারতীয় রাগ-রাগিনিতে স্পর্শানুভূতির অভাব রয়েছে, ব্যাকরণের কঠোরতা ও সুরকারের কৃত্তিমতার জন্যে। তাই তিনি 'কৃষ্ণ যাত্রা'র গঠন অনুসরন করে, তাঁর সাথে সদ্য শেখা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মিল ঘটান। এই থেকেই হয়ত রবীন্দ্র নাট্য চেতনায় নতুনত্বের সূচনা ঘটে। যদিও "বাল্মীকি প্রতিভা"য় যাত্রার প্রভাব যথেষ্ট বোধগম্য, কিন্তু মঞ্চস্থ নাটক বাস্তবধর্মী ঐতিহ্য দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে। "ফাল্গুনী", "শারদোৎসব", "রক্তকরবী" ও "মুক্তধারা" নাটকগুলি বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে নবপরিবর্তন এনে দিয়েছে। "রক্তকরবী" ও "মুক্তধারা"-র মতন নাটকে আমরা যাত্রার সরাসরি উল্লেখ পাই। "মুক্তধারা"য় একজন নামহীন পথিক যাত্রা গানের কথা বলে। আর "রক্তকরবী" –তে নন্দিনী বলে যে কিভাবে যাত্রাপালায় শ্রীকান্ত একজন রাক্ষসের রূপ ধারন করে, যা দেখে বাচ্চারা ভয় পেয়ে যায়। এইথেকে আমরা বুঝতে পারি, কিভাবে যাত্রার শুধু পরিকাঠামো নয় তাঁর সাথে নাটকের ভিতরের চরিত্ররাও যাত্রার উল্লেখ করে। "শারদোৎসব" নাটকের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মঞ্চের ধারনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে যখন তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন তখন তিনি স্থায়ী মঞ্চ ব্যবহারের পরিবর্তে নাটক করার জন্যে খোলা আকাশের নীচ বেছে নিলেন। শান্তিনিকেতনের খোলা আবহাওয়ায় এরকম মুক্তমঞ্চে নাটক খুব সফল হতে শুরু করে। স্থায়ী মঞ্চের অভাবে নাটকগুলি মুক্তমঞ্চে হতে থাকে যা এইসমস্ত নাটকে এক নতুন মাত্রা এনে দেয়। রবীন্দ্রনাথ এরকম একটা যাত্রাপালার কথা ভেবেছিলেন যেখানে মঞ্চে

কোনপ্রকার ছবি আঁকা থাকবে না আর যেখানে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে এক গভীর যোগসূত্র থাকবে। “ফাল্গুনী”, “শারদোৎসব”, “অচলায়তন” ও “মুক্তধারা”-র মতন নাটকে মঞ্চের অনুপস্থিতি দর্শক কে নাটকের এক অংশ করে তুলতে সাহায্য করেছে। এবং নাটকগুলি সবার মনে গেঁথে যেতে সাহায্য করেছে।

রবীন্দ্রনাট্যে গানের ব্যবহারের মধ্যে দিয়েও যাত্রার প্রতিফলন পাওয়া যাই। মঞ্চসজ্জার অনুপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ খুব জোর দিয়েই তাঁর নাটকে গানের ব্যবহার করেন এবং গানকে তাঁর নাটকের মুখ্য অংশ হিসেবে তুলে ধরেন। যাত্রাতেও গান ব্যবহার করা হয় কোন সংলাপ শেষ করতে অথবা ব্যাখা করতে। “রাজা” নাটকেও ঠাকুরদা বলেন তাঁর মন কোন এক আসন্ন বিপদ অনুধাবন করতে পারছে এবং তাঁর পরেই গান ধরেন “আমার সকল নিয়ে বসে আছি”। যাত্রায় ‘বিবেক’ চরিত্র কখন কখন গান করে আবার কখন ঘটনার উপর মন্তব্য করে এবং দর্শকের মনের অবস্থাও ব্যক্ত করে। যদিও রবীন্দ্রনাথের নাটক চলাকালীন ‘বিবেক’ কখনও মঞ্চে উঠে আসে নি, তবে হয়ত “রক্তকরবী”-র বিশু, “ফাল্গুনী”-র সর্দার, “রাজা”-র ঠাকুরদা, “অচলায়তন”-এ দাদাঠাকুর চরিত্রগুলি সৃষ্টির সময় রবীন্দ্রনাথের ‘বিবেক’ এর কথা মাথায় ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতীকী নাটকে গানের প্রাচুর্য আছে। এই সব নাটকে তিনি গান ব্যবহার করতেন কোন সংলাপের প্রসারনের ক্ষেত্রে অথবা ‘কোরাস’ হিসেবে। “শারদোৎসব”-এর মতন ঋতুবিষয়ক নাটকে গানের ব্যবহার কোন ঋতুর উৎসবানুষ্ঠানের জন্যই ব্যবহার হয় – “মেঘের কোলে রোদ হেসেছে” অনুষ্ঠানের নতুন আমেজ এনে দেয়। “ফাল্গুনী” নাটকে গান সংলাপের চেয়েও মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এডওয়ার্ড থম্পসন মনে করেন – “ফাল্গুনি একরকম ভাবে কবির নিজস্ব ইস্তাহার। দারোয়ানের জিজ্ঞাসাকেই হয়ত তাঁর ধারার নীতিকথা ধরে নিতে হবে – ‘গান দিয়ে জবাব দেওয়া কি তোমার রীতি?” (১১৩) “ফাল্গুনী”-র “আমাদের খেপিয়ে বেড়াই” গানের মধ্যে দিয়ে এক অদ্ভুত আনন্দের আমেজ ছড়িয়ে দেয়। “রাজা”-র “আমি রুপে তোমায় ভোলাবো না/ভালবাসায় ভোলাবো” গানের মধ্যে দিয়ে পুরো নাটকের বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে যেখানে ভালবাসাকে জগৎ জয়ের চাবিকাঠি ধরা হয়।

১৯২০র দশকের শেষের দিকে লেখা নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথের রঙ্গমঞ্চের উপর গবেষণা তাঁর শিখরে পৌছায়। যাত্রার নৃত্য তাকে মুগ্ধ করেছিল। পরবর্তীকালে “ছেলেবেলা”-য় তিনি লেখেন তিনি ঠিক কেমন অনুভব করতেন যাত্রাপালার সেই নাচের প্রতি, যেটা তাকে দেখতে দেওয়া হত না। তিনি লেখেন – “ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে নাচের তাল, সামনে এসে ঠেকতেই ঝমাঝম করতাল” (২৫)। তিনি বাংলার লোকনৃত্যকে উৎসাহ দেন এবং ঐতিহ্যবাহী মনিপুরী নৃত্যর সাথে পরীক্ষা নীরিক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথ যিনি পরিব্রাজক হয়ে নানান দেশ ঘুরে বেরান, নিজ সত্ত্বার বিকাশ ঘটান এবং অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে শিক্ষা লাভ করেন। জাভা ও বালির নৃত্যকলা তাঁর খুব পছন্দ ছিল। যখন তিনি জাপান যান, তখন ওখানকার নাচ দেখে তিনি এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি বলেন যে জাপানের নাচ ‘সম্পূর্ণ’ কিন্তু ইউরোপীয় নৃত্য ‘অর্ধেক ব্যায়ামকৌশল, আর অর্ধেক নাচ’। তিনি হয়ত যাত্রায় নাচ

দেখে এবং তাঁর সাথে জাভা, বালি ও জাপানের নৃত্যকৌশলে মজে নৃত্যকে দর্শকের সাথে যোগসাধনের আরেকটি মাধ্যম হিসেবে দেখেন। একজন নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ প্রবল ভাবে একজন পরিব্রাজক রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই নতুন ধরনের মঞ্চে সংলাপ হয়ত যথেষ্ট ছিল না তাই জন্যেই তিনি নাটকে এই নতুন ধরনের নাটকের সাথে যুক্ত করে দেন। শব্দের মায়াজালের মধ্যে এই সময় প্রবেশ করতে অস্বীকার করে। 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৯), 'শ্যামা'(১৯৩৯) প্রভৃতি নাটকে নাচ শারীরিক গতিপ্রকৃতি ও অঙ্গভঙ্গির সঙ্কেত হিসেবে কাজ করে আর গান সেখানে সংলাপের পরিবর্তে কাজ করে। মঞ্চের ইতিহাসে এইভাবে নতুন সঙ্কেতবাদ তত্ত্বের শুরু হয়। যেটা এর পূর্ব অব্দি যাত্রার এক সামান্য অংশ হিসেবে পরিচিত ছিল, সেটা এই সময়ের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের নতুন ধারার নাটকের সাথে যুক্ত হয়। এই নতুন ধরনের প্রদর্শনে নাচ ও গানকে পাশাপাশি রেখে বিবেচনা করতে গিয়ে সবার প্রথমে সেই পরিব্রাজক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাই মাথায় রাখতে হবে যিনি জাভা, বালি ও জাপান ঘুরে এসে সেখানকার নৃত্যচর্চার সাথে ভারতীয় নৃত্যের সংমিশ্রন ঘটিয়ে তাঁর রঙ্গমঞ্চে নব নাট্য চেতনাই এক মুখ্য ভুমিকা দিয়েছেন।

নাট্যকার হিসেবে তাঁর নাট্য জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ যাত্রার বিভিন্ন বিভাগকে কাজে লাগিয়ে নাটক রচনা করেছেন, যা আমাদের জাতীয় সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ হয়ত চেয়েছিলেন ঐতিহ্যশালী দেশীয় সংস্কৃতির পুনর্জীবন দিয়ে আমাদের জাতির ঐতিহাসিক বোধকে অনুপ্রানিত করতে। তিনি জানতেন অন্যান্য সাংস্কৃতিক মাধ্যম ও দক্ষতার তুলনায় নাটক হল এমন এক মাধ্যম যা দিয়ে সবার মনে জাতিগত সচেতনতা অনেক সহজেই সিক্ত করা যায়। ছাপার অক্ষরের বাইরেও এর আলাদা এক আবেদন আছে। অ-কাল্পনিক রচনায়, উপন্যাসে জাতীয়তাবাদের ধারনা একটি মুখ্য স্থান নেই। তিনি যথেষ্ট সচেতন হয়ে, গ্রামের এক পরিবেশ সৃষ্টি করেন তাঁর নাটকে এবং বোঝাতে চান ভারতীয় সংস্কৃতিতে গ্রামই হল মুখ্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দু এবং সেটির পুনরুদ্ধার দরকার। গ্রাম পুনর্গঠন প্রক্রিয়া তে শ্রীনিকেতন-এর গঠন জাতীয় সংস্কৃতির পুনর্জীবনের এক কৌশল। ইংরেজ শাসকেরা খুব সুব্যবস্থিত ভাবে তাদের উপনিবেশকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিল, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দুই ভাবেই। সেইজন্যে তাঁরা খুব কৌশলে স্ব-প্রণোদিত পরিকল্পনার সাথে এদেশে নবজাগরণ আনার কথা প্রচার করে। ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটা জাতীয়তাবোধের অভাব আনার জন্যেই ইংরেজরা চেয়েছিল গ্রামভিত্তিক ভারতীয় সংস্কৃতিকে নষ্ট করে দিতে। তাঁরা প্রাচ্যকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিল, এডওয়ার্ড সাঈদ এর কথায় – "আধিপত্য, পুনর্গঠন এবং প্রাচ্যের উপর প্রাধিকার থাকা" (৩)। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের আমাদের সংস্কৃতিকে নষ্ট করার সুব্যবস্থিত পরিকল্পনা বুঝতে পারেন, আর বোঝেন যে, এটা হয়ে উঠতে পারে আমাদের জাতির জন্যে মারাত্মক। আশিষ নন্দি তাঁর The Intimate Enemy (১৯৮৩) বইয়ে ঔপনিবেশিকতার দুইদিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। একদিকে যেমন তিনি ঔপনিবেশিকতা কে ভৌগলিক স্থান দখলের খেলা বলেছেন, সেরকম অন্যদিকে তাঁর মতে ঔপনিবেশিকতা হল মানুষের মন এবং সেখানকার সংস্কৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন। নান্দির মতে –

এই ঔপনিবেশিকতা দেহ থেকে বেশি মনের উপরেই আধিপত্য স্থাপন করেছিল এবং তাঁরা তাদের ক্ষমতা মুক্ত করেছিল এই সব উপনিবেশগুলির উপরেই, যাতে করে তাঁরা তাদের সাংস্কৃতিক অগ্রাধিকার পরিবর্তন করে। এই প্রক্রিয়ায়, আধুনিক পাশ্চাত্যের ধারনাকে বিশ্বজনীন করে তুলতে, ভৌগলিক ও সময়গত সত্ত্বার ধারনা থেকে উত্তীর্ণ করে মানসিক করে তোলে। পাশ্চাত্য এখন সর্বত্রই, পশ্চিমেও এবং বাইরেও, মনেও এবং অবয়বেও। (XI)

যদিও ১৯০৭ এর দিকে রবীন্দ্রনাথ মুখ্য ধারার স্বাদেশি আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান, কিছু গঠনমূলক স্বদেশি ভাবধারা তুলে ধরতে, যেটা আমরা দেখি "ঘরে বাইরে"র নিখিলেশ এর মধ্যে। মঞ্চ তাঁর কাছে এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে ওঠে ব্রিটিশ রাজের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরোধিতা করার জন্যে। হিংসা দিয়ে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করার তিনি বিপক্ষে ছিলেন। ইংরেজ শাসনের রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেন এবং ফিরে যান যাত্রার পুরনো ঐতিহ্যময় লোকসংস্কৃতিতে, যা দিয়ে তিনি ইংরেজ শাসনের জয়ের গতিকে রুখে দিতে ছেয়েছিলেন। মঞ্চে গানের মধ্যে দিয়ে গ্রাম্য পরিবেশ তৈরি, কিছু গ্রাম্য চরিত্রের ভুমিকা সবই ছিল এই দেশের উপর বিদেশী সরকারের সাংস্কৃতিক আধিপত্য গঠনের চেষ্টার বিরোধিতা করা, ভারতকে বৃহত্তর ইংল্যান্ডের অংশ করা থেকে আটকানো। "শারদোৎসব"-এর "আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়া", "রক্তকরবী"র "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে" গানগুলি গ্রামের আবহাওয়া এনে দেয়। "রাজা", "মুক্তধারা" এই সব নাটকে গ্রাম্য চরিত্রের ঘনঘটা। এইভাবে চরিত্রগুলি একত্রিত হয় মঞ্চে। একই সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত থাকার অনুভুতিটাই ভারতীয় গ্রাম্য সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গ্রাম্য জীবনে ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে তিনি তাঁর লক্ষ্য ও মতবাদ খুব সহজেই ছড়িয়ে দিতে পারতেন তাঁর লেখা এবং অভিনয়-এর জন্যে নাটকের অনুবাদ করনের মধ্যে দিয়ে। যদিও রবীন্দ্রনাথ সর্বদা ব্যস্ত ছিলেন তাঁর জাতির পুরোনো ঐতিহ্যকে পুনরূদ্ধারের চেষ্টায়, তবে তিনি কখনো পাশ্চাত্যের সবকিছুকে দূরে সরিয়ে দেননি। প্রতিটি দেশের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে, সেটা নিয়ে জানতে এবং তাঁর ভালো দিক গুলি তুলে ধরতে তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন। শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একটা 'ম্যানিকিয়্যান' সম্পর্কের কথা জেনেও রবীন্দ্রনাথ 'বড় ইংরেজ', 'ছোট ইংরেজ' এর অস্তিত্বের কথা বিশ্বাস করতেন, যেটি তিনি খুব ভালোভাবে দেখিয়েছেন তাঁর "ছোট ও বড়" নিবন্ধে (১৯১৭)। তাঁর মতে যে সমস্ত ইংরেজ ভারত শাসন করতে চায়নি, যারা সত্য, ন্যায়, স্বাধীনতাকে তুলে ধরেছিলেন তাঁরা "বড় ইংরেজ"। আর যারা ভারতে তাদের ক্ষমতা জাহির করতে এবং শাসন করতে আসে তারাই "ছোট ইংরেজ"। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অবধি কবি এই ধারনা নিয়েই চলতেন। যাত্রার কথা বললে তিনি অবশ্যই মানুষের মধ্যে স্বদেশি প্রেম, জাতীয়তা বোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন। যদিও তিনি সর্বদাই পশ্চিমা জাতির ধারনার সাথে একমত ছিলেন না, যেটা ছিল শুধুই একটা "ভৌগোলিক দানব"। জাতির এই কট্টর ধারনাকে অস্বীকার করে, পশ্চিমা সংস্কৃতির ভালো দিক গুলিকে আপন করে নেন এবং প্রাচ্যের নাট্যের কিছু ঝোঁককে শুধরে দেন। যাত্রার প্রভাব সত্ত্বেও কেউ তাঁর নাটকে সঙ্কেত ও অভিব্যাক্তির প্রভাব আস্বীকার করা যায় না। জার্মান অন্তরভিব্যক্তিবাদী নাটক গরগ

কেইসার এর "গ্যাস" এবং এরনেস্ত টলার এর "দা মেশিন রেকার" এর সাথে "রক্তকরবী"র মিল পাওয়া যায়। তাঁর নাটকগুলিকে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মিলনস্থল বলা চলে। "In Search of a New Language for Theatre" প্রবন্ধে আধ্যাপক অভিজিৎ সেন লেখেন –

> লোকসংস্কৃতির উপর তাঁর ভালোলাগা তিনি ধরে রেখেছিলেন, তবে যাত্রা আদলের অন্ধ প্রতিরূপে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। সেই সাথে, তিনি যতই পাশ্চাত্যের মঞ্চ উপস্থাপনার সমালোচনা করে থাকেন না কেন, মঞ্চের প্রয়োজনীয়তায় দরকার পড়লে সেগুলি ব্যবহার করতেন। একজন প্রযোজক হিসেবে, তিনি প্রায়ই সত্যিকারের মঞ্চের অবস্থা মেনে নিয়ে, একটি সার্বগ্রাহী আদর্শ কে তুলে ধরতেন, যেখানে উপাদানগুলি বাস্তবধর্মী আবার আবাস্তবও, নগরভিত্তিক আবার গ্রাম্য, ঋণ নেওয়া আবার দেশীয়, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে, সব একসাথে অবস্থান করতে পারে। (৪৫)

সবশেষে বলাই যে, 'সাম্রাজ্যবাদী অনুকরন' যখন বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতিতে পুরোদমে চলছে, তখন রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তায় ও মঞ্চে যাত্রার ভুমিকা অস্বীকার করা যায় না। একদিকে যেমন লোকসংস্কৃতি থেকে নেওয়া এই কাঠামো মঞ্চ সংস্কৃতিতে দেশীয় স্বাদ ফেরত এনেছিল, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের ঐ যুগে এই নাটক মানুষের পরিচয় স্থাপনে মুখ্য ভুমিকা পালন করে এবং জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধিতে মঞ্চ ও লেখার অবদানও নির্ণয় করে। তিনি যাত্রায় ফিরে যেতে ছেয়েছিলেন যেটাকে ধরা হয় ভারতীয় ইতিহাসের এক আধার এবং রঙ্গমঞ্চের উঠে আসার পর, যেটাকে খুব নিম্নমানের শিল্প বলেই ধরা হয়। যদিও তিনি সবসময় দেশীয় সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্যের উপরে ধরে "ঘরে-বাইরে"র সন্দিপের 'হিংসাত্মক স্বাদেশিকতা' কে ঘৃণা করেন নি। রবীন্দ্রনাথের নাট্য চিন্তায় যাত্রার উপস্থিতি ও তাঁর সাথে পাশ্চাত্যের প্রভাব, শুধুমাত্র একটি বিশ্বজনীন চেতনারই উদাহারন কে তুলে ধরে না, তাঁর সাথে একটি আধুনিক নান্দনিকতার ধারনাকেও প্রশ্রয় দেয়, যেখানে 'উচ্চ শিল্প' 'নিম্ন শিল্প' এই ধারনা গুলি মিশে গেছে এবং বৃহত্তর আখ্যানের মতবাদকে পৃথক করে দিয়েছে। যেখানে সাম্রাজ্যবাদীর যুগে রাজনীতিতে নান্দনিকতা খুবই প্রকট ছিল, এবং কলকাতার রঙ্গমঞ্চের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ রুপে শাসকদের হাতে বাঁধা ছিল, আর কিছু শাসিত মানুষ তাদের ক্রমাগত অনুকরন করে নাটক করে চলেছিল, সেখানে যেভাবে রবীন্দ্রনাথ নাট্য চিন্তায় ও মঞ্চে যাত্রাকে মিলিয়ে দেন, সেটা 'নান্দনিকতায় রাজনীতি'র এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

তথ্যসূত্র

Benjamin, Walter. "The work of Art in The Age of Technological Reproducibility: Second Version." *The work of Art in The Age of Its Technological Reproducibility And Other Writings Oon Media.* Eds. Michael W.Jennings, Brigit Doherty and Thomson Y. Levin. England: HUP, 2008. 19-55. Print. https://doi.org/10.2307/j.ctv1nzfgns.6

Nandy, Asis. *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self Under Colonialism.* Delhi: OUP, 1983. Print.

Said, Edward. *Orientalism: Western Conceptions of the Orient.* 3rd ed. Harmondsworth: Penguine, 1991. Print.

Sen, Abhijit. "In Search of a New Language for Theatre." *India Perspectives.* Ed. Navdeep Sen. 24.6 (2010): 38-45. Print.

Tagore, Rabindranath. Rabindra Natyasamagra. Thompson, Edward. *Rabindranath Tagore- Poet and Dramatist.* Delhi: OUP, 1992. Print.

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার। *বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।* পর্ব ১৪, কোলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা: লি:, ২০১২। প্রিন্ট।

চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ। *সাধারণ রঙ্গালয় ও রবীন্দ্রনাথ।* কোলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৯৯। প্রিন্ট।

ঘোষ, শঙ্খ। *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাথ।* কোলকাতা: দে'জ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫। প্রিন্ট।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *জাপান যাত্রী* । রবীন্দ্র রচনাবলী। কোলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্হনবিভাগ, ১৯৯০। প্রিন্ট।

---। রবীন্দ্র রচনাবলী। ১ম খণ্ড। কোলকাতা : বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪০৬। প্রিন্ট।

---। রবীন্দ্র রচনাবলী। ২য় খণ্ড। কোলকাতা : বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪০৬। প্রিন্ট।

---। "ছোট ও বড়"। রবীন্দ্র রচনাবলী। ১২তম খণ্ড। কোলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৯০। ১৪৯-৫০। প্রিন্ট।

---। "রঙ্গমঞ্চ"। *বিচিত্র প্রবন্ধ।* বিশ্বভারতী গ্রন্হনবিভাগ : কলিকাতা, ভাদ্র ১৪০১। পৃ : ৭৫। প্রিন্ট।